ঘ্যাচাং

রক্তাক্ত উহুদের স্মৃতিবিজড়িত-সকাল
অবলম্বনে একটি ক্ষুদে-উপন্যাস

আদিল মোর্শেদ

সত্যায়ন
প্রকাশন

“তোমাদের ওপর যুদ্ধ ফরজ
করা হয়েছে, অথচ তা
তোমাদের অপছন্দ।”

সূরা বাকারা, ২ : ২১৬

*তরজমা: কুরআন মাজীদ, শাইখ জিয়াউর
রহমান মুন্সী, মাকতাবাতুল বায়ান।*

শুক্রবার।

বেলা তখন প্রায় মধ্যদুপুর। মাথার ওপর শাওয়ালের চকচকে আসমান। আর সেই আসমান থেকে রোদ ঢেলে দেওয়ার কাজে সূর্যের কোনো বিরাম নাই। প্রখর সে তাপ। কাপড়ে শরীর ঢেকে না রাখলে, চামড়া পুড়ে মুহূর্তেই কেমন যেন কালচে হয়ে যায়!

'তবু তো এখনো চান্দি বরাবর রোদ লাগতেছে না!' ভাবতে ভাবতে এই গরমে পথ চলছিলেন সালামা ইবনু সালামা ইবনি ওয়াক্‌শ (রহিমাহুল্লাহ)। জুমুআর সময় হয়ে আসতেছে—ওযু-গোসল সেরে পাক-সাফ হওয়া দরকার। গন্তব্য তাই কুবার ছোট্ট একটা ঝরনা। পথে পড়ে জায়তুন বাগান, সারি সারি গাছের ছড়ানো-ছিটানো ছায়া। আর সেই ছায়ায় মাঝে-মধ্যেই মরু শালিক কিংবা কবুতরের দেখা মেলে। এ ছাড়া

কুবার ঝরনাতে পানি পান করার আশায় প্রায়ই জড়ো হয় তিলোর, লাওয়া কিংবা বালিহাঁসের মতো সুস্বাদু সব পাখি। রওনা দেওয়ার সময় তাই ধনুক আর আধ-ডজন তির পিঠে ঝুলিয়ে নিতে কোনো ভুল হয়নি।

বাগান পার হওয়ার আগেই মাটিতে মৃদু একটা কাঁপন টের পেলেন সালামা। সঙ্গে সঙ্গে শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল তার! এক ঝটকায় পিঠ টান টান করে দাঁড়ালেন। বাতাসে কান পেতে কী যেন শোনার চেষ্টা করলেন মুহূর্তখানেক; মুখে এক অনিশ্চয়তার ছায়া। এরপর আর দেরি না করে দিলেন সোজা ভোঁ-দৌড়। তবে মদীনার দিকে নয়, বরং কুবার মুখে—বাগান থেকে দ্রুত বের হওয়ার আশায়। কেন, তা গাছের ছায়া ছেড়ে বেরিয়ে আসতেই বোঝা গেল। মরুভূমির ধু-ধু বালিতে ওই যে আগুয়ান ঘোড়সওয়ার দেখা যায়।

আরবের বুকে বড়-হওয়া-প্রতিটা শিশু জানে, মরুভূমিতে চোখের ওপর খুব একটা ভরসা করতে নাই। এমনিতেই দুপুরের কড়া রোদে চোখ মেলে চাওয়া শক্ত। তার ওপর সূর্যের আলো এই জমিনে প্রায়ই আজব সব খেল দেখায়। তাই সওয়ারেরা কত দূরে, তা বুঝতে এবার পাথুরে মাটিতে

কান পাতেন সালামা। মিনিট পুরো হওয়ার আগেই আবার ওঠে বসেন; ফোঁস করে তার বুক থেকে এক দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে যায়। দূরত্ব এমনকি এক ফারসাখেরও[১] কম—এই অবস্থায় পালানোর চেষ্টা অর্থহীন। এদিক-ওদিক ইতস্তত চাইতেই পাথরের এক বিশাল চাঁইয়ের দিকে চোখ পড়ে তার। অন্তত পনেরো-ষোলো হাত উঁচু তো হবেই! তরতর করে পাহাড়ি চিতার মতো লাফিয়ে উঠে যান তার ওপর। একদম চিত হয়ে শুয়ে পড়েন নিজেকে লুকিয়ে ফেলার আশায়।

উঁচু থেকে এইবার সালামার চোখে আগন্তুকদের সংখ্যা পরিষ্কার হয়। সব মিলিয়ে দশটি ঘোড়া। আরোহীও দশ জনই হওয়া উচিত। সাথে কোনো উট নেই, কাফেলার তো প্রশ্নই ওঠে না। তার মানে এরা হয় ডাকাত, কিংবা কুরাইশ। তবে দল যেটাই হোক, মতলব ওই একটাই—লুটপাট। মদীনার বাসিন্দাদের ক্ষয়-ক্ষতি। আর নবির শহরেই যে তার বাড়ি! নিজের ঘরে ডাকাত যাচ্ছে; সালামা কি বসে বসে তামাশা দেখবেন? দাঁতে দাঁত ঘষে তাই পিঠ থেকে ধনুকখানা আলগা করে নেন তিনি।

সালামার ব্যাগে তির আছে সাকুল্যে ছয় খানা। তারমানে প্রতিটি তিরও যদি

জায়গামতো লাগে তবুও দুশমনদের ঠেকানোর উপায় নেই। কিন্তু সেই চিন্তায় কোন আরব আবার কবে পিছিয়ে এসেছে! শান্ত, সুস্থির হাতে ধনুকের দুই প্রান্তে রশি বাঁধেন সালামা। তারপর তির হাতে শুরু হয় অপেক্ষা।

সে প্রতীক্ষার প্রহর মোটেই দীর্ঘ হয় না অবশ্য। খানিক পরেই খুরের আওয়াজ প্রকট হয়। আর মাথা তুলে সালামা ছুড়ে দেন তাঁর প্রথম তির। সে তির বাতাস কেটে, অদ্ভুত এক গুঞ্জন তুলে এগিয়ে যায়। থরথর করে কাঁপে ডাঁটির শেষ প্রান্তে লাগানো শকুনের পালক। উড়তে উড়তে গিয়ে সোজা দুশমনদের এক ঘোড়ার দেহে বিঁধে যায়, সাথে সাথেই শোনা যায় পশুটার কলজে-ছেঁড়া আর্তনাদ। মাঝ আকাশে ঘুড়ি যেমন গোত্তা খায়, তেমনি ছুটতে ছুটতেই ঘোড়াটা হঠাৎ হোঁচট খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তার আরোহী অবশ্য লাফিয়ে দূরে সরে যেতে চেয়েছিল। জ্বলজ্বল চোখে সালামা দেখেন সেই চেষ্টার ব্যর্থতা। ঘোড়ার নিচে পড়ে পা খানা ভর্তা হয়ে যায় আরোহীর, প্রাণীটার সাথে যোগ হয় তার চিৎকার। মৃদুস্বরে 'আল্লাহু আকবার' তাকবীর দিয়ে সালামা পুনরায় ধনুকে তির বাঁধেন। তারপর আরেকটা। তারপর আরও একটা।

হাতের তির ফুরোতে ফুরোতে ঘোড়সওয়ারের দল প্রায় চলে এসেছে। অবশ্য ততক্ষণে দশ জনের মধ্য থেকে তিন জন খতমও হয়ে গেছে! ভাবতে গিয়ে হঠাৎ থমকে যান সালামা। 'খতম' বলা হয়তো ঠিক হবে না। তিনি তো শুধু ঘোড়া থেকে পড়তে দেখেছেন, মরতে তো আর দেখেননি! তির ফুরিয়ে এবার সালামা একটা পাথর তুলে নিলেন। প্রায় হাতের তালুর সমান গোল পাথর—ঢিল দিয়ে দুশমন পর্যন্ত নেওয়া যাবে কি-না, তা ঠিক নিশ্চিত হতে পারেন না। চকিতে ভাবেন, আগে ছুড়েই দেখি! দেখা যাক যায় কি-না!

এসব চিন্তার মাঝেই থেমে যায় খুরের আওয়াজ। কাছে, খুব কাছে। ঘটনা বোঝার জন্য মাথা তোলেন সালামা। আর প্রথমেই চোখ যায় মাথায় উঁচু করে পাগড়ি-বাঁধা এক যুবকের দিকে। সঙ্গে সঙ্গেই সালামার বুকটা ধড়াস করে ওঠে। যুবকের নাম জানেন না সালামা, জানার প্রয়োজনও নেই। সে নির্ঘাত বনু মাখযুমের লোক। তাকে মক্কার বাজারে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখেছেন সালামা। এতে সর্ষে পরিমাণ সন্দেহ নেই।

মানে হলো, কুরাইশরা চলে এসেছে।

এখন একটা উপযুক্ত লড়াইয়ের আশায়

বসে থাকা মানায় না। যত দ্রুত সম্ভব নবিজির কাছে খবরটা বরং পৌঁছে দেওয়া জরুরি। তাই সড়সড় করে পাথরের গা বেয়ে পিছলে নামেন সালামা। তারপর অতি-পরিচিত ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে তিনি চললেন মদীনার দিকে। তবে ধূর্ত কুরাইশদের চোখ এড়ানো গেল না। তারা পিছু নিয়েছে বুঝতেই সালামা জান হাতে নিয়ে দিলেন এক দৌড়। সমান তেজে ধাওয়া দিলো কুরাইশরাও।

শিকার আর শিকারির দল ছুটতে ছুটতে বনু আশহালের জমিনে নেমেছে মাত্রই, হঠাৎ চারদিক থেকে এগিয়ে আসে জনা আষ্টেক সশস্ত্র আনসার। সবাই বনু আবদিল আশহাল গোত্রের লোক। দূর থেকেই এই ধাওয়ার ওপর চোখ রাখছিল তারা। হাজার হোক, লোকজন সব ছুটে যে তাদের যব-খেতের দিকেই আসছে! কোন মতলবে তা আচ্ছামতন 'যাচাই' না করে ছেড়ে দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

বনু-আশহাল এগিয়ে এসেছে, তা টের পাওয়া মাত্র থেমে গেল কুরাইশ দল। কালবিলম্ব না করে ফিরতি পথ ধরল তারা। আর সালামা চিৎকার করে উঠলেন, 'কুরাইশরা এসে গেছে! ও আল্লাহর বান্দারা! কাফিরের দল এসে গেছে!'

মদীনা। মসজিদে নববি। জুমুআর নামাজের পর।

‘বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম’ বলে মিম্বরে উঠে দাঁড়ালেন আল্লাহর রাসূল ﷺ, আর সঙ্গে সঙ্গে মসজিদের উঠানে নেমে এল পিনপতন নীরবতা। ঝাউ আর খেজুর ডালের ছাউনি-দেওয়া উঠানে আজ জড়ো হয়েছে মদীনার সমস্ত পুরুষ—ছেলে-শিশুরাও বাদ যায়নি। আশে-পাশে এসে জড়ো হয়েছে এমনকি ইহুদিরাও। শহরের বাইরেই যে কুরাইশদের বিশাল বাহিনী লড়াইয়ের অপেক্ষায়, সে খবর ছড়িয়েছে দাবানলের মতন। আল্লাহর রাসূল কী পদক্ষেপ নেবেন, তা নিয়ে চলছে হরেক রকম জল্পনা-কল্পনা।

তবে নবিজি কিন্তু শুরুতে কুরাইশদের নিয়ে কিছুই বললেন না। খানিকক্ষণ চুপ থেকে শুরু করলেন, ‘হে আমার সাহাবিরা, কাল

রাতে আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি। দেখলাম, আমার গায়ে খুব শক্তিশালী একটা বর্ম। হাতে তলোয়ার, কিন্তু সে তলোয়ারের মাথা ভেঙে গেছে। আরও দেখলাম, আমার আশপাশে গাভি জবাই হচ্ছে, আর আমার পেছনে একটা আরদাহ[২]।'[৩]

সম্মুখে জনগণ নড়েচড়ে বসল। নবিজির স্বপ্ন তো যেনতেন স্বপ্ন নয়! আল্লাহর বার্তা। নবি ইবরাহীম ﷺ-এর কাছে ইসমাঈলকে জবেহ করার আদেশ তো স্বপ্নেই এসেছিল! এ কি তেমনি কোনো আদেশ? আগ্রহী জনতা জানতে চাইল, 'হে আল্লাহর রাসূল, এর অর্থ কী?'

নবি ﷺ জবাব দিলেন, "বর্মটি হলো মদীনা। ভাঙা তলোয়ার মানে, লড়াইয়ে আমি কষ্ট পাব।"

এই পর্যন্ত বলে আল্লাহর রাসূল ﷺ আবার কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। তাঁর পবিত্র মুখ যেন কীসের ছায়ায় ঢেকে গেল। ধীরে ধীরে তিনি আবার শুরু করলেন, 'আর গাভির বিষয়ে আল্লাহর ফায়সালাই সর্বোত্তম।'[৪]

এরপর নবিজি সরাসরি নেমে এলেন যুদ্ধের আলোচনায়, 'আমরা মদীনায়ই থাকব। শত্রু যদি এগিয়ে আসে, তবে এখানেই

মোকাবিলা হবে। তাহলে কেমন হয়?'[৫]

একদম সামনের সারিতে বসে ছিল আবদুল্লাহ ইবনু উবাই। মুনাফিক সর্দার। গায়ে লিনেনের একখানা বাহারি আলখাল্লা, কাতারি ডিজাইন। কাঁধ থেকে হাত পর্যন্ত অংশটুকু শ্যাওলার মতো সবুজ মখমলে ঢাকা। আর মখমল কাপড় মানেই হয় শাম, নয়তো পারস্যের প্রোডাক্ট। কারণ, হিজাযের এই চামড়া-পোড়া গরমে মখমল গায়ে দিয়ে রাস্তায় নামে কোন বলদ? তবুও ইবনু উবাই গায়ে দিয়েছে, কেননা ব্যাপারটায় একটা রাজকীয় রাজকীয় ভাব অস্বীকার করবার উপায় নেই। আলখাল্লার সাথে রুপার দুইটা ছোট ছোট ঘণ্টাও ছিল। একটা ডান কাঁধে লাগানোর জন্য, আরেকটা বাম হাঁটুর নিচে। এইটাই নাকি 'ফ্যাশন'! পারস্য সাম্রাজ্যের বড় বড় সেনাপতি আর গভর্নরেরা নাকি এমনেই ঘুরে বেড়ায়! ইবনু উবাইও সেই অনুযায়ী আজ নেতার মতো সেজেগুজে বের হবে, ঠিক এমন সময় ঝামেলা লাগাল খাওলা।

বহুত হিসেব-নিকেশ করে আবদুল্লাহ ইবনু উবাই নাজ্জার গোত্র থেকে এই বউটা নিয়েছিল। কিন্তু এ এমনই মেয়ে মানুষ, মুখে কোনো লাগাম নাই। তাকে দেখেই

ঠোঁটের এক কোনা বাঁকিয়ে বলে কি-না, 'ছাগলের বাচ্চার মতো ঘণ্টা ঝুলায়া কই যান?' ছাগলের বাচ্চা! ছাগলের বাচ্চা!! আরে, ছাগলের বাচ্চার গলায় দেওয়া হয় তামার ঘণ্টা। আর তারটা পয়সা-গলানো খাঁটি রুপা। দুইটা কি এক হইল! এই সহজ জিনিসটা বেআদব বউটাকে বোঝাতে গেলে তার ঝটপট জবাব, 'আপনে যখন যুদ্ধের জন্য লোহার জামাটা গায়ে দিয়া হাঁইটা যান, তখন খুব সুন্দর আওয়াজ হয়। ওইটা ছাড়া পুরুষ মানুষের গা থিকা আর কোনো টুংটাং আওয়াজ ভালো লাগে না।'

এই শুনে হঠাৎ-ই থমকে গেল ইবনু উবাই। কথাটা একেবারে ফেলে দেওয়া যায় না। বউ ব্যাপারটাকে যেভাবে দেখছে, তার আরব বন্ধু-বান্ধবও সেই লাইনেই দেখার চান্স আছে। তাই ঘণ্টা খুলতে হলো। আবদুল্লাহ ইবনু উবাই অনেক কিছু, কিন্তু সে বোকা না। বোকামি করে কেউ খাযরাজিদের নেতা হতে পারে না। আর এই জন্যই রাজকীয় আলখাল্লাটা গায়ে দেওয়া দরকার, এমনকি ঘণ্টা না থাকলেও।

কুরআনে অনুমতি আসার পর মক্কা থেকে সাহাবিরা একজন-দুজন করে হিজরত করা ধরলেন। তখন থেকেই ইবনু উবাইয়ের